দ্বিতীয় খণ্ড

ইতিহাসের ছিন্নপত্র

(অবিভক্ত পাকিস্তানের শাসনকাল)

কায় কাউস

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

মুখবন্ধ

পরম করুণাময়ের অসীম কৃপায় "ইতিহাসের ছিন্নপত্র"র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। বর্তমান খণ্ডে অবিভক্ত পাকিস্তানের চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে ঘটনাবহুল, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক কালপর্বের এক বহুমুখী বয়ান সংকলিত হয়েছে। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে সত্তরের নির্বাচন পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি।

সার্বিক আযাদী আর এক স্বতন্ত্র আবাসভূমির স্বপ্নে বিভোর উপমহাদেশের নিপীড়িত সংখ্যালঘু মুসলমানদের বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা আর সংগ্রামলব্ধ পাকিস্তান মাত্র দু-যুগের ব্যবধানে কীভাবে এক ভঙ্গুর রাষ্ট্রে পরিণত হলো, কীভাবে বৃহত্তর মুসলিম জাতিসত্তার আবেগমথিত ধর্মীয় চেতনার স্থলে জন্ম নিল স্থূল আঞ্চলিকতাবাদ আর সংকীর্ণ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, কীভাবে ব্যর্থ হলো এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সকল সম্ভাবনা, কীভাবে দেশ থেকে দল, দল থেকে ব্যক্তি প্রাধান্যের নষ্ট রাজনীতির ঘটল উন্মেষ আর পরিণতিতে অনিবার্য হয়ে উঠল রক্তাক্ত বিচ্ছিন্নতা—আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের এই জটিল ঘটনাবহুল পরিক্রমাকে অনুসরণ করতে হলে, তার অন্তর্নিহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘটনাবলির উৎস সন্ধান করতে হলে আমাদের ইতিহাসের এই একটিমাত্র কালপর্বকেই গভীরভাবে পাঠ করা জরুরি। এই সময়টুকুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের রাজনীতির সমস্ত অধঃপতন, ব্যর্থতা, ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, শঠতা, মিথ্যাচার আর কদর্যতার বিষবৃক্ষের বীজ। এই কালপর্বকে পাঠ ব্যতিরেকে আমাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞান তাই কখনোই পূর্ণতা পেতে পারে না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের জন্ম থেকে শাহেদ আলীর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসনের অভিষেক পর্যন্ত কালপর্ব তাই আমাদের ইতিহাসের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

যার পূর্ববর্তী আর পরবর্তী সকল রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত আর উত্থান-পতনের জবাব রয়েছে এই কালপর্বেই।

উক্ত সময়কালে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাবলির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সুলভ, দুর্লভ, প্রচলিত, অপ্রচলিত বয়ানের সারসংক্ষেপ সংকলনের মাধ্যমে আমি চেষ্টা করেছি পাঠককে সেই কালপর্বকে যথাসাধ্য অনুধাবনযোগ্য করতে। তাই বলাই বাহুল্য, সে অর্থে এটি সংকলনধর্মী আকর গ্রন্থ হয়ে উঠলেও কোনো ধ্রুপদী ইতিহাসগ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত বিপুল তথ্যমালা আগ্রহী পাঠকদের আরও গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করলেই আমি আমার প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করব।

পরিশেষে এই সংকলন প্রকাশে যারা অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ জুগিয়েছেন, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে পরম মমতা আর ভালোবাসায় ছায়ার মতো আমাকে জড়িয়ে রেখেছেন—তাদের সবার অপরিশোধ্য ঋণ গভীর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি। বিশেষভাবে বর্তমান বৈরী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বইটি প্রকাশের ঝুঁকিপূর্ণ দুর্বহ দায়িত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করায় গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আর বিনীতভাবে দায় ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি সংকলনে উদ্ধৃত সকল তথ্যসূত্রের লেখক, প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীদের প্রতি।

বিপুল কলেবরের বইয়ে স্বভাবতই কিছু অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদ এবং ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে থাকতে পারে। আশা করি পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধনের আশা রাখি। ইতিহাসের পুনর্পাঠ আনন্দময় হোক। হার্দিক শুভকামনা।

কায় কাউস
৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন : ভাঙনের পূর্বাভাষ

প্রথম পর্ব

বিভাগপূর্ব উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ ১৩

দ্বিতীয় পর্ব

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন : আন্দোলনের সূচনাপর্ব ২৫

তৃতীয় পর্ব

কায়েদ-এ-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র ঢাকা আগমন ও রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক ৪৩

চতুর্থ পর্ব

বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন : প্রেক্ষিত ও পর্যালোচনা ৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা : বৈরিতার বিস্তার

প্রথম পর্ব

যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ : মন্ত্রিত্ব, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ১২৯

দ্বিতীয় পর্ব

আন্তঃদলীয় কোন্দল : শহীদ সোহরাওয়ার্দী বনাম ফজলুল হক এবং যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন ১৮৯

তৃতীয় পর্ব

অন্তর্দলীয় কোন্দল : শহীদ সোহরাওয়ার্দী বনাম মওলানা ভাসানী এবং ন্যাপের জন্ম ২১২

চতুর্থ পর্ব
উপদলীয় কোন্দল : শেখ মুজিবুর রহমান বনাম আতাউর রহমান খান ২৫২

পঞ্চম পর্ব
গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক : ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী হত্যাকাণ্ড ২৬৮

তৃতীয় অধ্যায়
স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকাল : বিচ্ছিন্নতার শেষাঙ্ক

প্রথম পর্ব
আইয়ুব খান ও তার দশক : বিপ্লবী প্রয়াস ও পরিণতি ২৯১

দ্বিতীয় পর্ব
৬ দফা : বিভক্তির পথে যাত্রা ৩৫২

তৃতীয় পর্ব
আগরতলা ষড়যন্ত্র : ভাঙনের নীল নকশা ৩৮১

চতুর্থ পর্ব
উত্তাল ঊনসত্তর : দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর ৪২৯

পঞ্চম পর্ব
সত্তরের নির্বাচন : সমাপ্তির শুরু ৪৭৩

প্রথম পর্ব
বিভাগপূর্ব উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ

এক

"... ১৮৬৭ উর্দু-হিন্দি বিবাদের ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরে। কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতে যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা আর টিকে রইলো না। এখান থেকেই ভারতে, বিশেষত: শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ফণা বিস্তার করতে আরম্ভ করে। এখানেই দ্বিজাতি তত্ত্বের সূচনা হয়।

হিন্দুদের এই উর্দু-বিরোধিতা লক্ষ্য করে ফরাসী প্রাচ্য ভাষাবিদ গারসিঁ-ডি-ট্যাসী বলেছিলেন : '... শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য মূলত উর্দু-হিন্দি বিবাদেরই অপর নাম।' তিনি হিন্দি আন্দোলনের নায়ক বাবু শিব প্রসাদের উর্দু-বিরোধিতাকে হীনমন্যতা বলে অভিহিত করেন।

১৮৬৭ সালে বেনারসের কমিশনার মিঃ সেক্সপীয়ারের সাথে মুসলমানদের শিক্ষা-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন :

'... এখন আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, দুই জাতি (হিন্দু-মুসলিম) কোন কাজে আন্তরিকভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। এখন তো বিরোধ কমই দেখছেন। দিনদিন তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের (হিন্দুদের) ব্যবহারে এ বিরোধিতা ও শত্রুতা আরো বাড়তেই থাকবে। যাঁরা বেঁচে থাকবেন, দেখতে পাবেন।"

সেক্সপীয়ার প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন : 'যদি আপনার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়, তবে তা হবে নিতান্ত দুঃখজনক ব্যাপার।' তখন স্যার সৈয়দ বলেছিলেন : 'আমিও এর জন্য দুঃখিত। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত।'

স্যার সৈয়দ হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পর্কে 'আলীগড় শিক্ষাসার্ভে রিপোর্টে' আরো বলেন :

'... ত্রিশ বছর ধরে আমি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করে আসছি। উভয় জাতি মিলিতভাবে উভয়ের মঙ্গল সাধনে সচেষ্ট হোক - এটাই ছিল আমার নিত্য কামনা। কিন্তু যখন থেকে হিন্দু বাবুরা উর্দু ভাষা ও ফার্সী অক্ষরকে ভারতীয় মুসলিম শাসনের প্রতীক মনে ক'রে এর বিলুপ্তি সাধনের মতলব আঁটলেন, তখন থেকেই আমার নিশ্চিত ধারণা হলো যে, হিন্দু ও মুসলমান একযোগে দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিকল্পে আর কোন কাজ করতে পারবে না। আমি আমার অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয়ের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে কপটতা বিরাজ করছে, উর্দু-হিন্দি বিবাদের ফলেই তার সূচনা হয়েছে।'

'বাবায়ে উর্দু' ডক্টর আবদুল হক দ্বিজাতি তত্ত্বের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধের উৎপত্তি হয় উর্দু-হিন্দি বিবাদ থেকে এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্মও হয় এখানে। তিনি আরো বলেন, সাধারণত বলা হয় যে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ একটি রাজনৈতিক ইস্যু এবং 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' প্রতি স্যার সৈয়দের বিরোধিতার ফলেই এই ইস্যুর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। বস্তুত হিন্দুরা যখন উর্দুর বিলুপ্তি সাধনে উঠেপড়ে লাগলো, তখন থেকেই হিন্দু-মুসলিম বিরোধ দানা বাঁধতে আরম্ভ করে॥"[১]

[১] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ/স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা ॥ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন - জুন, ১৯৮২। পৃ. ৩৮৭-৩৮৮]

দুই

"... স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমান শিক্ষিত যুবকদের কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ দিলেও তাহা যখন মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানে বিরত করিতে পারে না, তখন ইংরাজের সাহায্যে পুষ্ট হইয়া উত্তর প্রদেশের হিন্দুদের এক বিরাট শক্তিশালী অংশ উর্দু ভাষার পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা প্রচলনের দাবি করে এবং দেখা যায় ১৯০০ সালে যুক্তপ্রদেশ সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারে উক্ত প্রদেশে হিন্দী ভাষা প্রচলন সরকারি সমর্থন লাভ করিয়াছিল। মুসলমান ইহার বিরোধিতা করে। এই ভাষা প্রচলন করিবার আন্দোলন দীর্ঘ দিন চলে।

ইংরাজ শাসন আমলে উর্দু ও ফার্সী ভাষার পরিবর্তে সরকারি দপ্তর ও আদালতে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন করিলে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা বয়কট করে কিন্তু তাহার পর তাহারা যখন ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে তখন ইংরেজির পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইহা যে কেবল মুসলমান সমাজ ও যুবকদের আরও দীর্ঘদিন ভারতের রাজনীতি হইতে সরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহার বিরুদ্ধে ছাত্রীর নবাব মহসীন-উল-মুলক্ আলীগড়ে এক প্রতিবাদ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নবাব সাহেব তখন আলীগড় কলেজ পরিচালনা সমিতির কার্যসচিব। এই সভা অনুষ্ঠিত হইবার পর লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্বয়ং আলীগড় কলেজ পরিদর্শন করিতে যান এবং ট্রাস্টিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, 'নবাব সাহেব হয় উর্দু কনফারেন্সের সভাপতি থাকিবেন নতুবা কলেজের কার্যসচিবের কার্য করিবেন, যে কোন একটি পদ বাছিয়া লইতে হইবে।' ট্রাস্টিগণের চাপে এবং অনুরোধে ইংরাজ বিরাগভাজন নবাব সাহেবকে উর্দু কনফারেন্সের সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ কনফারেন্সকে রাজনৈতিক দলের আন্দোলন

বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। 'খন্ডিত ভারতে' ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, 'কেবলমাত্র কলেজের কর্ম সচিব স্যার সৈয়দ আহমদ নহেন, অধ্যক্ষ মিঃ বেক পর্যন্ত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ব্যবস্থা, সামরিক ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস, লবণশুল্ক প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবির বিরোধিতা করিবার জন্য তাহাদিগকে রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা দেখাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু নবাব মহসিন-উল-মুলকের বেলায় উর্দু সভায় সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হয়।'

১৯০১ সালে নবাব মহসীন-উল-মুলক্ 'মহামেডান পলিটিক্যাল অরগেনাইজেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তাহাতে তিনি কর্মচারী রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ও আদর্শ অক্ষুন্ন হওয়া সত্ত্বেও সরকার এইরূপ সংস্থানের অননুমোদন দেন নাই। ইহার ফলে নবাব সাহেবের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়॥"[২]

তিন

"... ১৯০০ সালের ১৮ আগস্ট তারিখে লক্ষ্ণৌতে উর্দু প্রতিরক্ষা সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ভাষণ দানকালে নবাব মহসিন-উল-মূলক বলেন :

'যদিও আমরা কলম চালাই না এবং আমাদের কলম শক্তিশালীও নয় - যার জন্য অফিসেও আমাদের খুব কমই দেখা যায়, তবুও আমাদের তলোয়ার চালানোর শক্তি আছে এবং মহারানির জন্য আমাদের হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ। ... এক মুহূর্তের জন্যও আমরা ভাবতে পারি না যে সরকার আমাদের পরিত্যাগ করবে বা উপেক্ষা করবে, যেসব জিনিসের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করে সেগুলোর ব্যাপারে এমন কিছু ঘটতে দেবে যাতে আমাদের জীবন শোকাবহ হয়ে উঠে। আমি বিশ্বাস করি না যে সরকার আমাদের ভাষাকে মরে যেতে দেবে। সরকার তাকে বাঁচিয়ে

[২] আবদুল ওয়াহিদ/উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান ॥ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন - ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩। পৃ. ৫৬-৫৭]

রাখবে। ওটা কখনো মরবে না। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, আমাদের ভাষাকে হত্যা করার জন্য অপর পক্ষ যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা যদি চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে যেকোন সময় ওটা বাধার সম্মুখীন হবে। এইসব ভয়ের কারণেই আমরা আমাদের ভাষাকে জীবন্ত রাখার প্রয়াসে কিংবা ওটা না পারলেও এর মরদেহটাও না হলে সাফল্যের সাথে বয়ে নিয়ে যাবার কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। যখন কিছু কিছু সমস্যার কারণে সমগ্র জাতিই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তখন কোন আন্দোলন গড়ে তোলা বা জনগণকে জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হল জনমতকে একটি সহনীয় স্তরে নিয়ে আসা এবং মানুষের মন থেকে সরকারের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা থাকলে তা দূর করা।'

... ১৮ অক্টোবর, ১৯৩৭ তারিখে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে উর্দু সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাব :

'যেহেতু উর্দু ছিল মূলত একটি ভারতীয় ভাষা এবং সেটার উৎপত্তি হয় হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে এবং এদেশের জনগণের একটা বড় অংশ এই ভাষায় কথা বলত, তাই একটা অখণ্ড জাতীয়তা গঠনে তা সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়, তাই এর স্থলে যেটা হিন্দুস্থানি ভাষা নামেও অভিহিত সেই হিন্দিকে প্রতিস্থাপন করলে উর্দু ভাষার আঙ্গিক ভিত্তিটাই তা উল্টিয়ে দেবে আর এই সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাই সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ভারতের সকল উর্দুভাষী মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারি সকল ক্ষেত্রে তাদের ভাষার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাবার আহ্বান জানাচ্ছে এবং যেখানেই সংশ্লিষ্ট এলাকার ভাষা উর্দু সেখানেই সেই ভাষার ব্যবহার ও উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়ার এবং যেসব এলাকায় সেটা প্রধান ভাষা নয় সেখানে ওটাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ানো এবং সকল সরকারি অফিস, আদালত,

আইনসভা, রেলওয়ে ও ডাকবিভাগে এই ভাষার ব্যবহারের বিধান রাখা উচিত বলে মুসলিম লীগ মনে করে। উর্দুকে যাতে ভারতে সার্বজনীন ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে চেষ্টাও করা উচিত।'

প্রস্তাবক : রাজা আমির আহমদ খান সাহেব (রাজা সাহেব মাহমুদাবাদ, ইউপি)

সমর্থকবৃন্দ :

মওলানা করিমুর রাজা খান সাহেব, ইউপি।

হাসান রিয়াজ সাহেব, ইউপি।

গোলাম হাসান সাহেব, বেরার।

এস. এম. হাসান খান সাহেব, বোম্বাই॥"[৩]

চার

"... কোন মাদ্রাসাপন্থী বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে বোধহয় রবীন্দ্রনাথকে কিছু লিখিয়াছিলেন। তিনি কি লিখিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয় নাই। সুতরাং তাহার কথার যথার্থতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে যে উত্তর দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ১৩৪১-এর 'প্রবাসী' বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উত্তরের কয়েকটি লাইন এইরূপ :

'আজকের বাঙ্গলা ভাষা যদি বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্টরূপে ও সহজভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে তারা বাঙ্গলা পরিত্যাগ করে উর্দ্দু গ্রহণ করতে পারেন।'

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। বয়সেও তরুণ নহেন, বাঙ্গলার প্রবীণতম সাহিত্যিক। উপরে তাহার যে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে–তাহার ভিতরে যে উষ্মা ও অসংযম প্রকাশ পাইয়াছে তাহা

[৩] পাকিস্তান আন্দোলন : ঐতিহাসিক দলিলপত্র/জি অ্যালানা (অনু : কে এম ফিরোজ খান) ॥ [খান ব্রাদার্স - ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ. ১৯/১৩১-১৩২]

রবীন্দ্রনাথের গৌরব বাড়াইয়া দিবে কিনা তাহার বিচার আমরা করিব না। ভাষা যে কাহারো আবদার বা নিষেধের অপেক্ষা রাখে না, তাহার প্রমাণ তিনি নিজেই। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম বাঙলা ভাষাকে যে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন সে রূপ মুছিয়া গিয়া তাহার স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের তুলির রূপ। এ রূপও হয়তো চিরস্থায়ী হইবে না। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কোন শক্তিশালী লেখকের প্রভাবে অথবা সাহিত্যিকদের শুধু নূতনত্বের মোহেই এ রূপ বদলাইবে।...

এসব কথা রবীন্দ্রনাথ যে জানেন না তাহা নহে। তবু কিন্তু তিনি মুসলমানদিগকে নোটিশ দিয়াছেন, 'আজকের বাঙ্গলা ভাষা যদি বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্টরূপে ও সহজভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে তারা বাঙ্গলা পরিত্যাগ করে উর্দ্দু গ্রহণ করতে পারেন।' বিদ্যাসাগরের ভাষা যেদিন রবীন্দ্রনাথের ভাব 'সুস্পষ্টরূপে ও সহজভাবে' প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ কি সেদিন বাঙ্গলা ভাষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ভাষার আশ্রয় লইয়াছিলন, না নিজের মনের আনন্দে পথ কাটিয়া নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন? তবে আজ মুসলমানের উপর এ নোটিশ কেন?

রবীন্দ্রনাথ হয়তো ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন–নূতন ভাষা যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তাহারই সম্পত্তি। তাহার উপর আর কেহ উপদ্রব করিবে ইহা তাহার সহ্য হয় না। তাই অধৈর্য হইয়া তাহাকে অসংযত উক্তি করিতে হয়। বাঙ্গালী মুসলমানের মনের অনন্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পদকে তিনি হারাইতে প্রস্তুত, তবু বাঙ্গলা ভাষার পরিবর্তন তাহার অসহ্য। বাঙ্গালী মুসলমানও যদি রবীন্দ্রনাথকে নোটিশ দেয়–'আমরা যে ভাষায় কথা কহি তাহা নিতান্তই আমাদের। সেই ভাষায় আমাদের মনকে প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের আছে। ইহাতে যদি কাহারো অসুবিধা হয় তিনি বাঙ্গলা ভাষা ছাড়িয়া দিয়া অন্য কোন ভাষার চর্চ্চা করিতে পারেন'–তবে রবীন্দ্রনাথের

উত্তরটি কি?" (মাদ্রাসাপন্থী ও রবীন্দ্রনাথ : সম্পাদক / ছায়াবীথি, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ; ১৩৪১, আষাঢ়)[৪]

পাঁচ

"... ১৯১৮ সালে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের হিন্দি সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বহু ভাষাবিদ ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি সাধারণ ভাষা হিসেবে বাংলার দাবি পেশ করেন। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতীতেই এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ভাষাতত্ত্ববিদ পন্ডিতগণ সে সভায় হাজির হন এবং আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। প্রস্তাবে ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রথমে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে তাকে ভারতের অন্যতম সাধারণ ভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, শুধু ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বাংলা ভাষার স্থান হবে সর্বোচ্চে। শুধুমাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি একথা বলেননি। একজন ভাষাতাত্ত্বিক-এর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ মন্তব্য করেছেন।

(ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শতবর্ষ পূর্তি স্মারকগ্রন্থ/সম্পা. মুহাম্মদ আবু তালিব, পৃ. ৩৬১-৩৬৩)

পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায়ই ১৯২১ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের কাছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য লিখিতভাবে দাবি উত্থাপন করেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। দাবি নামায় তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন :

'ভারতের রাষ্ট্রভাষা যা-ই হোক, বাংলার রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বাংলাকে।'

১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে মাওলানা আকরাম খাঁ সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন :

---

[৪] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম/সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (দ্বিতীয় খন্ড) ॥ [বাংলা একাডেমী - ফেব্রুয়ারি, ২০০৫। পৃ. ৩৫১-৩৫২]

'বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায়ই তাদের লেখা ও কথা মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন বাংলা ভাষা আজ রাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রতিষ্ঠিত॥"[৫]

ছয়

"... ১৯২৬ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ চালু হয়। আমি ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বিএ ক্লাশে ভর্তি হই। কলকাতায় এটাই মুসলমানদের জন্য প্রথম কলেজ এবং একমাত্র কলেজ। কলেজটি সরকারি। নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কলেজের কাজ শুরু হয়। মিঃ এ এইচ হালে প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে ইনি ছিলেন কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। ইনি আরবী এবং হিব্রু ভাষায় এমএ ছিলেন। অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন জনাব আলতাফ হোসেন (পরে পাবলিসিটি বিভাগের পরিচালক ও 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক ও পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন), জনাব আবু হেনা, জনাব জহুরুল ইসলাম, উর্দু সাহিত্যের কবি 'তুতিয়ে বাঙ্গালা' খ্যাত রেজা আলী ওয়াহাসাত প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ।

কিছুকাল পরই কলেজ ছাত্র সংসদ গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়। নির্বাচন নিয়ে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং ভীষণ প্রতিযোগীতা শুরু হয় বাংলা ও উর্দু ভাষী ছাত্রদের মধ্যে। দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী দল। শুরু থেকেই ভাষা ভিত্তিক প্রচারণা শুরু হয়। বিষয়টি ইসলামিয়া কলেজের ঘরোয়া ব্যাপার হলেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী ছিলো। পরবর্তীকালের ইতিহাস তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সৃষ্টি হয় পূর্ব পাকিস্তানে (পূর্ব বাংলা) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন।

---

[৫] সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ/ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত ॥ [বিসিবিএস - জুলাই, ১৯৯৮। পৃ. ২৪৩]

বাংলাভাষী ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও উর্দুভাষী ছাত্রদের বাইরের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ বাংলাভাষী ছাত্রদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয় কারণ এদের অধিক সংখ্যক ছাত্রই কলকাতার বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত। কলকাতায় স্থানীয়ভাবে তাদের কোন পৃষ্ঠপোষক ছিলো না। এছাড়া বহিরাগত উর্দুভাষী ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দেয় কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা উর্দুভাষী ছাত্ররা। কলকাতার বাসিন্দা বাংলাভাষী ছাত্রের সংখ্যা ছিলো কম। বাংলাভাষী ছাত্রদের মধ্যে পূর্বেকার পরিচয় না থাকায় সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সম্পাদক মনোনয়নের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়। এক বৈঠকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে, এমন একজন ছাত্রকে সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করতে হবে যিনি বাঙ্গালী ছাত্র সমাজে অন্তত কিছুটা পরিচিত। অনেক আলোচনার পর হাবিবুল্লা বাহারের নাম উল্লেখ করা হয়। বাঙ্গালী ছাত্র সমাজে তরুণ উদীয়মান সাহিত্যিক হিসাবে তিনি এর মধ্যেই পরিচয় লাভ করেন। শেষটায় সিদ্ধান্ত হলো যে তাকে চট্টগ্রাম থেকে এসে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম করা হয়। সঙ্গে ভর্তির ফরমও পাঠিয়ে দেয়া হয়। দু'দিন পরই টেলিগ্রামের উত্তর আসে যে তিনি অসুস্থ কিন্তু প্রেরিত ভর্তির ফরম পুরণ করে রেজিস্ট্রি ডাক যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং জানান হয় যে, অন্তত দু'এক মাসের মধ্যেই তিনি উপস্থিত হতে পারবেন। এতে আমরা অনেকটা দমে গেলাম। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি উঠে যে অনুপস্থিত ছাত্রকে কোনো পদে মনোনীত করা যাবে না। তাই পরবর্তী বৈঠকে সর্ব সম্মতভাবে দু'জনকে বিএ ক্লাশের সৈয়দুল হককে সহ সভাপতি আইএ ক্লাশের মো: ওয়াজেদকে সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

উর্দু ভাষীদের মধ্যে থেকে সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয় সৈয়দ মোহাম্মদ আলীকে। ইনি ময়মনসিংহের ধনবাড়ীয়ার জমিদার বাঙ্গালী নওয়াব নবাব আলী চৌধুরীর পৌত্র। কিন্তু তিনি উর্দুভাষী। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। পুরুষানুক্রমে ও

বংশানুক্রমে বাঙ্গালী হলেও বাংলাভাষা শেখেননি। উর্দুই ছিলো তার কথ্য ভাষা এবং নিজেকে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে ছিলেন নারাজ। আর সহ সভাপতি পদে মনোনীত করা হয় যদিও এখন সঠিক মনে পড়ছে না তবে খুব সম্ভব প্রিন্সিপাল কামাল উদ্দিন সাহেবের ছেলে এ. বি. জেড হান্নানকে। তিনি ছিলেন বিএ ক্লাশের ছাত্র।

প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব কলেজের বাইরেও প্রতিফলিত হয়। কলকাতার উর্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে বিষয়টি আলোড়ন সৃষ্টি করে। নির্দিষ্ট দিনে তুমুল উত্তেজনা উদ্দীপনার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বাংলাভাষী প্রার্থীরা বহু ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হয়। প্রতিপক্ষের কেউই নির্বাচিত হতে পারেনি। এ জয় শুধু ইসলামিয়া কলেজের বাঙ্গালী মুসলমান ছাত্রদেরই জয় ছিলো না, এ জয় ছিলো বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর॥"[৬]

সাত

"... ব্রিটিশ শাসনামলে এবং ব্রিটিশের পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের বহু আগেই, ভারতের তথা উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর চল্লিশ কোটি মানুষের এবং বহু ভাষাভাষী জনগণের দেশ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা কি হবে, সে বিষয়ে সাহিত্যিক-সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। ১৯১৮ সালে মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত চেয়ে এক পত্র লেখেন। জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'The only possible language for inter-provincial inter course is Hindi in India'. অর্থাৎ হিন্দী ছাড়া ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক সাধারণ ভাষা হওয়ার যোগ্য অন্য কোনো ভাষা নেই। (রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬৮,পৃষ্ঠা ৭৮)

---

[৬] খালেকদাদ চৌধুরী/শতাব্দীর দুই দিগন্ত ॥ [সুনেত্র - ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫। পৃ. ৫৭-৫৮]

... উপমহাদেশ তথা ব্রিটিশ ভারত অবিভক্তরূপে স্বাধীন হলে–অর্থাৎ ব্রিটিশের পরাধীনতা মুক্ত হলে, ভারতের রাষ্ট্রভাষা যে হিন্দী হবে সেটা একরূপ নিশ্চিতভাবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ধরে নিয়েছিলেন। অন্যপক্ষে, এটাও একরূপ নিশ্চিতরূপেই ধরে নেয়া হয়েছিল যে, উপমহাদেশ তথা ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান–এই দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দি এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। যদিও সেকালেই বাংলা ভাষাকে ভারতের–যদি অবিভক্তরূপে স্বাধীন হয়, সাধারণ ভাষা তথা রাষ্ট্রভাষারূপে মর্যাদা দানের এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটলে তার রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। যদিও একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা এবং বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর কেউ কেউ উর্দুকেই উপমহাদেশের এবং প্রতিষ্ঠিতব্য স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানেরও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কারূপে উর্দুকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে হিন্দি এবং উর্দু ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবির প্রেক্ষাপটের সন্ধান মিলে এবং বাংলা ভাষা কেন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হতে পারেনি, ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কেন একমাত্র উর্দু করার এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেয়ার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র হয়, কেন বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন করতে হয়, কেন ১৯৫২ সালে রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এবং ভাষা শহীদদের আত্মদানের বিনিময়ে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তারও পটভূমি এবং সূত্র-সন্ধান মিলে।

উল্লেখযোগ্য যে, উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং ১৯৪৭ সালে ভারত ও সাবেক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও বহু আগে হিন্দি এবং উর্দুকেই অবিভক্ত ভারতের তথা এ উপমহাদেশের সাধারণ ভাষা তথা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা তথা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষার যোগ্য আর

দাবিদার হিসেবে গণ্য করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হিন্দিকেই যে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং কার্যকর পন্থা অবলম্বন করেন সে-সম্পর্কে ১৩৪৫ সালের কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় : 'ভারতের মাতৃভাষাগুলি ঠিক রাখিয়া হিন্দী বা হিন্দুস্থানী বা উর্দুকে ভারতের সাধারণ ভাষা করিবার চেষ্টা কংগ্রেস করিতেছেন।... পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রভৃতি, যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী এবং তাহারা সমগ্র ভারতে হিন্দী'র ব্যবহার চান।' উল্লেখ্য, হিন্দু পণ্ডিত সমাজ, বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হিন্দীকে সারা ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালান, অন্যপক্ষে মুসলমান পণ্ডিত সমাজ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উর্দুকে ঠিক রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবি না জানালেও এই ভাষাকে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা রূপে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি উত্থাপন করেন। হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করার কংগ্রেসের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে 'মাসিক প্রবাসী' পত্রিকার 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বলা হয়, 'কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টায় মুসলমানদের সহিত ঝগড়ার আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। তামিল দেশে খুব বিরোধ চলিতেছে। অন্ধ্র প্রদেশে বিরোধিতাটা আপাতত চাপা আছে। হিন্দুস্থানী কে রাষ্ট্রভাষা করার একটা উপসর্গ এই হইয়াছে যে, ইহা শিখিয়া এই ভাষায় কে কি লিখিতেছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকিতে হইলে নাগরী অক্ষর, আরবি, ফারসি অক্ষর এবং রোমান অক্ষর, এই তিন রকম অক্ষর উত্তমরূপে পড়িতে, শিখিতে হইবে। কারণ, কংগ্রেসের মুসলমান পুরোহিত মৌলানা আবুল কামাল আজাদ সাহেব পাঁতি দিয়াছেন যে, রোমান অক্ষরও শিখিতে হইবে॥"[৭]

[৭] মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ / বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলন যুগে যুগে ॥ [নওরোজ সাহিত্য সম্ভার - জানুয়ারি, ২০১৮। পৃ: ১৩৩-১৩৫]